যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সব ভোট গণনা শেষের আগেই প্রাথমিক ফলাফল বিশ্লেষণে এ তথ্য জানিয়েছে ফক্স নিউজ। তাদের হিসাব-নিকাশ মতে, আর কোনোভাবেই কমলা হ্যারিসের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সর্বশেষ খবরে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের প্রাপ্ত ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের সংখ্যা ২৭৭। অপরদিকে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ২২৬টি ভোট। দেশটিতে মোট ৫০টি অঙ্গরাজ্যে ৫৩৮টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট রয়েছে। জিততে হলে ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেতে হবে। তা ইতিমধ্যে ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন এবং আরও কিছু রাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজ ভোট তার দখলে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ট্রাম্পের জয়ের খবরে বিভিন্ন রাজ্যে উৎসবে মেতেছেন তার সমর্থকরা। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারের প্রধান কার্যালয় থেকে বিবিসি জানিয়েছে, ফক্স নিউজ যখন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের অনুমান ঘোষণা করছিল তখন হলরুমে উপস্থিত সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। তাদের কান ফাটানো জয়ধ্বনিতে এক অন্যরকম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় অনেক সমর্থক আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ট্রাম্পের নামে স্লোগান দিতে থাকেন।

অপরদিকে কমলা এখনও হাল ছাড়ছেন না। তার প্রচারশিবিরের সহসভাপতি সেড্রিক রিচমন্ড বলেন, ‘আমাদের এখনও ভোট গণনা করা বাকি আছে। আমাদের এমন রাজ্য রয়েছে যেগুলোর ফল এখনও নিশ্চিত নয়। আমরা রাতেও লড়াই চালিয়ে যাব। যাতে প্রতিটি ভোট গণনা হয়। প্রতিটি কণ্ঠস্বর যাতে নিশ্চিত করা হয়। সুতরাং আপনি (সমর্থক) আজ রাতে ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ভাষণ শুনতে পাবেন না। তবে আগামীকাল তিনি ভাষণ দেবেন।’

এদিকে নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কিছু রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে স্নাইপার ইউনিট। রয়েছে কয়েক স্তরের গোয়েন্দা সতর্কতা। ভোট শেষেও বেশ কয়েক দিন এ ধরনের নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে

জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সূত্র: কালবেলা

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে লড়েছে মার্কিন গণমাধ্যম

সাবেক স্টেট সেক্রেটারি ও ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে ২০১৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার নির্বাচনে মার্কিন গণমাধ্যম বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকেরই ধারনা ছিল ট্রাম্প জয়লাভ করবেন না, জনপ্রিয়তার দিক থেকে হিলারি ছিলেন এগিয়ে। বলা হয়, ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া বিতর্কিত ভুমিকা পালন করেছে। অতীতে কখনই মিডিয়ার এমন অবস্থান কেউ দেখেননি। কারণ অনেক মার্কিন পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেল প্রকাশ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নেয়। আর হিলারিকে একজন ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরে, যা মার্কিন গণমাধ্যমের সুষ্ঠু নির্বাচনকেন্দ্রিক নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিন্ধ করে।

শুধু তাই নয়, একদিকে ট্রাম্পের প্রশংসা এবং অন্যদিকে হিলারি ক্লিনটনের ত্রুটি ধরে তুলতে ব্যস্ত ছিল মার্কিন গণমাধ্যম। এই অবস্থানই মার্কিন জনগণের কাছে বিতর্ক তৈরি করে নির্বাচন নিয়ে। মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর অনেকেই সেদেশের গণমাধ্যমকে ট্রাম্পের উত্থানের জন্য দায়ী করেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে ‘ঐতিহ্যগত’ ভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে গণমাধ্যম প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬০ সালের নির্বাচন থেকে এই প্রথা প্রচলিত। কারণ প্রার্থীর খবর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ গণমাধ্যম থেকেই বেশি পেয়ে থাকে। একজন প্রার্থীর বিষয়ে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কতটুকু করা হচ্ছে এবং কী উপায়ে করা হচ্ছে তার প্রতি

তাদের গবেষণায় দেখানো হয়, মিডিয়া উৎসগুলোর ব্যবহার এবং বিশ্বাসে পক্ষপাতমূলক মেরুকরণ গত পাঁচ বছরে বিস্তৃত হয়েছে। রিপাবলিকানদের একটি বড় অংশ ৩০টি উৎসের মধ্যে ২০টির আস্থা প্রকাশের চেয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করে। মাত্র সাতটি আউটলেট রিপাবলিকানদের মধ্যে অবিশ্বাসের চেয়ে বেশি আস্থা তৈরি করে, এর মধ্যে আছে ফক্স নিউজ এবং হোস্ট শন হ্যানিটি এবং রাশ লিম্বোগের টক রেডিও প্রোগ্রাম।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য, সংখ্যাটি প্রায় বিপরীত। ৩০টি উৎসের মধ্যে ২২টিতে অবিশ্বাস প্রকাশের চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশ আস্থা প্রকাশ করে। ফক্স নিউজ, শন হ্যানিটি এবং রাশ লিমবাগসহ মাত্র আটটি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

২০২০ সালে বাইডেন জয়লাভের পর প্রিন্স অব লিচেনস্টাইন মাইকেল এক নিবন্ধে বলেছেন, নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গণমাধ্যম, যারা পেশাদার রিপোর্টিং এবং সম্পাদনার চেয়ে তাদের মতামত এবং স্ব-সংজ্ঞায়িত ‘নৈতিকতা’ প্রচার করতে বেশি আগ্রহী ছিল। নির্বাচনের পরেও সাংবাদিকতার মানদণ্ডের এই বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ হবে না এবং এটি আরও প্রতিফলিত হবে।

তার মতে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পোস্টের দৃশ্যমানতা সীমিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সম্প্রচার মাধ্যম এবিসি, সিবিএস, সিএনবিসি এবং এমএসএনবিসি ট্রাম্পের ভাষণে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, যিনি প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়েছিলেন, তাকেও বাঁধা দেওয়া হয়েছিল এবং সম্প্রচারটি তার বক্তব্যকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সিএনবিসির মডারেটর বলেন, ‘আমরা এতে বাধা দিচ্ছি, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অনেকটাই অসত্য’।

তিনি মনে করেন, এটি করার মাধ্যমে, মিডিয়া আমেরিকান জনগণকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের দেওয়া ভাষণ থেকে বঞ্চিত করেছিল। কেউ ট্রাম্পের সাথে একমত হোক বা না হোক, মার্কিন নাগরিকদের তাদের রাষ্ট্রপতি কী বলেছেন তা শোনার অধিকার রয়েছে। মিডিয়ার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে- ‘ডেনমার্ক রাজ্যে কিছু পচে গেছে’।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা কোন দেশকেই দমাতে পারেনি, বাংলাদেশকে পারবে?

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গত সাড়ে তিন দশক ধরে পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক থেকে শুরু করে সিরিয়া, হালের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেও বাতাস দিচ্ছে তারা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই থাবা থেকে বাদ যায়নি আফ্রিকার দেশগুলোও। যখন যেখানে নিজেদের স্বার্থের বিষয় এসেছে, সেখানেই যুক্তরাষ্ট্র নানান কৌশল আর ছলচাতুরি আশ্রয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। জারি করেছে নানা ধরণের স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস আগে জারি করলো ভিসা নীতি। বিশ্বের বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, এটা তারা করেছে নিজেদের স্বার্থে এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তেক্ষেপ করলো। গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা আর সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক ভোটের অজুহাত দিয়ে, বাংলাদেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করলো যুক্তরাষ্ট্র। এর পেছনের গল্প হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভাল নয়। তাই তাদের লক্ষ্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করা।

বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শেষ দু’টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠছে। এখন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নানাভাবে ঘায়েল করছে তৎপর বাইডেন প্রশাসন। নিজেদের দেশের এসব অগণতান্ত্রিক আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। উল্টো নিজের মোড়লিপনা জাহির করে সেসব অপকর্ম ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করছে।

একটু পিছনের দিকে গেলে দেখা যায়, আজকে যে স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞার সংস্কৃতি চালু হয়েছে, এর শুরু হয়েছিল নব্বই এর দশকে এই

যুক্তরাষ্ট্রের হাত ধরেই। বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই ‘স্যাংশন পলিটিক্স’ এখন ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জর্জ লোপেজ যুক্তরাষ্ট্রের এই স্যাংশন পলিটিক্সকে নব্বইয়ের দশককে ‘স্যাংশন ডিকেডস’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিশ্লেষকদের দাবি, মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের কথা বলে স্যাংশন দেয়া হলেও বেশিরভাগ সময় ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের অধ্যাপক সায়ীদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন’ এর ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও অনেক দেশ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকে। যেমন ‘সৌদি আরব’। সেখানে মানবাধিকার বা গণতন্ত্র না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র কখনই তাদের নিষেধাজ্ঞা দেয় নি।

একইভাবে যদি আমরা পাকিস্তানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে দেশটি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সেনা হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত। সেখানেও দীর্ঘদিন গণতন্ত্র নেই। তারপরেও পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দেয় না। উল্টো আমেরিকার গণতন্ত্র সামিটে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পাঠায়।

এখন আমরা নির্দিধায় বলতে পারি, আমেরিকা নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য স্যাংশন দিচ্ছে। এক্ষেত্রে কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র, আবার কোথাও সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৯ হাজার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কিছু খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ওই বছরই বাইডেন প্রশাসন বিশ্বব্যাপী আরও ৭৬৫টি নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরমধ্যে ১৭৩টি ছিল মানবাধিকার ইস্যুতে।

যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে, বৈশ্বিক উৎপাদনে সেই দেশগুলোর অবদান প্রায় এক–পঞ্চমাংশ। এই উৎপাদনের ৮০ ভাগ দাবিদার চীন। কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়েই চীনকে দমাতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ চীনের উপর যতো নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক সেগুলো কোন কাজে আসছে না।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত এক হাজার ৯৪৮টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড ও কানাডা। এপর্যন্ত তারা যথাক্রমে এক হাজার ৭৮২টি এবং এক হাজার ৫৯০টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং তাদের অর্থনীতি অনেক বেশি টেকসই ও মজবুত হয়েছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিলেও সেগুলো শতভাগ কার্যকর করতে পারেনি নিষেধাজ্ঞা দেয়া দেশগুলো। যেসব পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে রাশিয়ায় যাচ্ছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা যারা কার্যকর করবে সেই ইউরোপ নিজেদের স্বার্থে সেটা করছে না। তারা কোনোভাবেই নিজেদের ব্যবসা নষ্ট করতে চাইছে না।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১২টি দেশ, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২২ সালে এসব দেশ রাশিয়ায় কাছে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করেছে। যেগুলোর উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা পণ্য রপ্তানিতে জার্মানি প্রথম এবং লিথুয়ানিয়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইরান ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছিল তিন হাজার ৬১৬টি। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত ও ইসরায়েলের মতো দেশ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বছরের পর এতো নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমেরিকা বা তার মিত্ররা থামাতে পারেনি। একই অবস্থা কিউবা, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও।

মোদ্দা কথা কোন নিষেধাজ্ঞাই এসব দেশের অর্থনীতি ধ্বসিয়ে দিতে পারেনি। বরং বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিকল্প পথের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাশিয়া ও চীন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা ভিসা নীতি নিয়ে আরও সোচ্চার হওয়ার সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের। এখন বাংলাদেশ নিজেদের প্রমাণ করার এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□